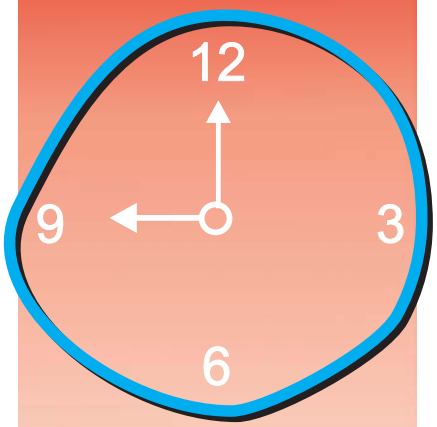

¯úU : c½ nvmcvZvj

‘পঙ্গু হাসপাতাল নিজেই পঙ্গু’

miKvwi nvmcvZvj gv‡bB Kg Li‡P wPwKrmv| mvaviY I Amnvq †ivMxi wfo| 80 weQvbvq 84 †ivMx| ks•Ljv I cwi”QbZvi Pig Afve| †ivMx‡`i mxgvnxb †fvMvwš| AwZwi³ †ivMxi Pv‡c Amv¯¨Ki cwi‡ek| RvZxq A‡_v‡cwWK nvmcvZv‡ji †envj `kv| Iqv‡W Qwo‡q-wQwU‡q _vKv c½ †ivMx‡`i gZB Pj‡Q nvmcvZvjwU...

লিখেছেন **সাজেদুর রহমান**

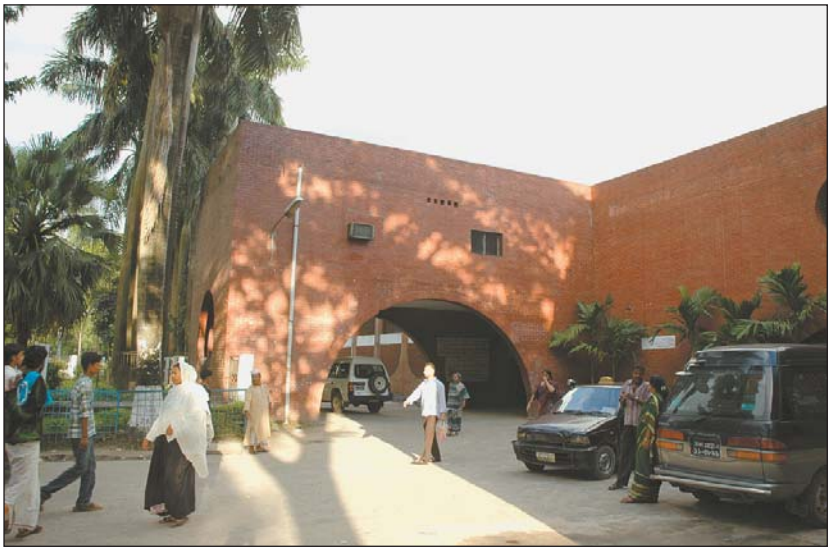

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পূর্ণীমা বেড পায়। ক্লান্ত পূর্ণীমা মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়ে

সকাল ৯টা : ‘স্যার ট্রেনের নিচে পড়েছিল। দুটো পা’ই ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে’। সহকারী ডাক্তার প্রফেসর মোঃ সিরাজুল ইসলাম রাউন্ড শুরু করেছেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোগীরা বেশ চুপচাপ শুয়ে আছে। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালের চেহারা এ মুহূর্তে ভিন্নরূপ। দিনের অন্যান্য সময়ের সঙ্গে প্রফেসরের এই রাউন্ডের সময়ের কোনো মিল নেই। রাউন্ড চলবে ১২টা পর্যন্ত।

দুপুর ১২.৩০ : প্রফেসরের রাউন্ড দেয়া শেষ। দুপুরে খাওয়ার আয়োজন চলছে। আজ ওয়ার্ডে ৮৪ জন রোগী। পুরুষ ওয়ার্ডে বিছানা ৮০টি হলেও রোগী ৮৪ জন। এখানে কী ধরনের রোগী আসে জানার জন্য কথা বললাম একাধিক চিকিৎসকের সঙ্গে।

হাসপাতালে রোগীদের ডায়াগনসিস হিসাব মতে সড়ক, ট্রেন ও নৌদুর্ঘটনায় রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়াও কাজের ক্ষেত্রে আঘাত, সহিংস ঘটনা, ছিনতাই, গাছ থেকে পড়ে এবং হাড়ের বিভিন্ন রোগের কারণে অনেক রোগী আসে। সিনিয়র একজন ডাক্তার জানান, বর্ষাতে সড়ক দুর্ঘটনা, জুন-জুলাইতে গাছ থেকে পড়া এবং নির্বাচনের আগে সহিংস ঘটনায় রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। তিনি আরো বলেন, ‘১৭ বছর আগে আমি যখন নতুন ডাক্তার হিসেবে এসেছিলাম তখন সহিংস রোগীর সংখ্যা দু’তিন মাসে পেতাম একটি কি দুটি। কিন্তু এখন প্রতি দিনই একাধিক এ ধরনের রোগী আসে হাসপাতালে। সন্দেহ নেই, সমাজ ক্রমশ সহিংস হয়ে উঠছে।’

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর প্রায় ৭০ ভাগের বয়স ১৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে, যারা সমাজের সর্বোচ্চ কর্মক্ষম একটা শ্রেণী। শতকরা হিসেবে গড়ে রোগীদের পেশা ড্রাইভার ১০ জন, শ্রমিক ৭ জন, বাস-ট্রাক হেলপার ৬ জন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ৫ জন, দিনমজুর ৬ জন, ছাত্র ৫ জন, গৃহিণী ৪ জন, কৃষক ও রাজমিস্ত্রির সংখ্যা ৩। এ ছাড়াও শিক্ষক, মাজারের খাদেম, ভিক্ষুক ও ৫ জন শিশু। নিম্ন আয়ের ‘লোকজনই বেশি আসছে’, বললেন ডিউটি ডাক্তার। ‘দরিদ্র মানুষের কাছে এখনো শেষ আশ্রয় তুলনামূলকভাবে সস্তা এই সরকারি হাসপাতাল। শহর জুড়ে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য প্রাইভেট ক্লিনিকের আকাশচুম্বী খরচ তাদের নাগালের বাইরে।’

দুপুর ১.৩০ : ১০ বছরের ছেলে ফজলু আম পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে তার ডান পা ভেঙেছে। প্রথমে গ্রামের হাড়ভাঙা কবিরাজের কাছে যায়। পায়ের অবস্থা আরো শোচনীয় করে ফজলুর বাবা ও ভাই তখন তাকে নিয়ে এসেছে এই সরকারি হাসপাতালে। সকাল ৯টা থেকে অপেক্ষায় থেকে সাড়ে চার ঘন্টা পর ডাক্তারের দেখা মেলে। ডাক্তার ফজলুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলেন, 'কী হইছে'? ফজলুর ভাই বলেন, 'স্যার আম গাছ থাইকা পইড়া গেছে।'

'কয়টা আম খাইছ?' কেউ উত্তর দেয় না। ডাক্তার ফজলুর পা-টা পরীক্ষা করছিলেন এমন সময় পাশ থেকে ফজলুর বাবা বলেন, 'পুঁজ বাইর হয়'। 'পুঁজ বের হবে না তো কি বের হবে? কবে পড়ছে গাছ থেকে'? ফজলুর ভাই বলে, 'এক সপ্তাহ'।

'মিথ্যা বলো না, পড়ছে- আরো আগে, গেছিলা তো কবিরাজের কাছে।'

'না স্যার, হাটের ডাক্তার দেখাইছি'।

'বেশি কথা বলো না। যাও রোগীকে ভর্তি করাতে হবে। এই টিকিট নিয়ে পাশের রুমে যাও।'

ফজলুকে ওটিতে নেয়া হচ্ছে

দুপুর ২.৪৫ : দুপুরের খাবার পর্ব তখনও শেষ হয়নি। সিএ লাঞ্চ এবং নামাজের বিরতি থেকে ফেরেননি। একজন ইন্টার্নি ডাক্তার এক রোগীকে ড্রেসিং করছিলেন; বাকি দু'জন ইন্টার্নি ডাক্তারদের রুমে বসে গল্প করছিলেন। কাজ এবং গল্প সেরে তারা যখন ওয়ার্ডের দিকে এগুলেন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

হাতে ব্যান্ডেজ করা বাদশা মিয়া, যন্ত্রণা কমেনি তখনো

অবসন্ন রহমত আলী বই পড়ে সময় কাটাচ্ছেন

বিকেল ৩.৫০ : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তালেব আলী সড়ক দুর্ঘটনায় পা ভেঙে ভর্তি হয়েছেন ১২ দিন আগে। আজ তার অপারেশন হবে। অপারেশন হওয়ার কথা ১টার দিকে, অথচ বিকেল হয়ে এলেও কোনো খোঁজ নেই কারোর। গত রাত থেকেই তালেবকে খেতে দেয়া হয়নি। শুকনা মুখে আতঙ্কিত হয়ে শুয়ে আছে তালেব। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতেই খানিকটা ভয়ার্ত স্বরে বলে, 'চোখ বন্ধ করলেই আমার মনে হয় আমি অপারেশনের রুমে অজ্ঞান হইয়া পইড়া আছি আর ডাক্তাররা আমার পা কাটতাছে। এক সময় অপারেশন শেষ হইল কিন্তু আমার আর জ্ঞান ফিরল না। আমি অজ্ঞান হইয়াই পইড়া থাকলাম। এমন তো হইতেও পারে। এ কথা ভাইবাই চমকাইয়া উঠি'। অপারেশনের আগে তালেবের অনেক আত্মীয়স্বজন তাকে দেখতে আসছে। একজন বয়স্ক আত্মীয় দোয়া পড়ে তালেবের সারা গায়ে ফুঁ দেন, বিশেষ করে পায়ের যে জায়গায় অপারেশন হবে সে জায়গায়।

তালেবের ভাই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে আসেন। আগের দিন তালেবের অনেকগুলো প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়, সেগুলোর রিপোর্টও নিয়ে এসেছে। হাসপাতালে শুধু রক্ত পরীক্ষা হয়। সে রিপোর্ট নিয়ে এলেন নার্স। তালেবের কাছ থেকে অপারেশনের সম্মতিপত্রেও সই নেয়।

বিকেল ৪.৩০ : তালেবকে ওটিতে নেয়া হয় সাড়ে ৪টায়। একজন মেডিকেল অফিসার এবং একজন ইন্টার্নি ডাক্তারের সহযোগিতায় সিএ অপারেশন করবেন। ডাক্তারি ভাষায় এর নাম 'ওপেন রিডাকশন অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিক্সেশন অব ফিমার উইথ প্লেট অ্যান্ড স্ক্রু'। অপারেশনের মাধ্যমে তালেবের ভাঙা উরুর হাড় খুলে সেটাকে বিশেষ ধরনের পাত এবং স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হবে। সিএ অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন দিতে তালেবের হাতে শিরা খুঁজতে থাকেন।

ডাক্তাররা যখন তালেবের উরুর হাড় নিয়ে ব্যস্ত তখন অপারেশন থিয়েটারের বাইরে করিডরে তালেবের স্ত্রী মোনাজাত করছেন, তার বাবা তসবি টিপছেন, তার ভাই এবং ছেলে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বেরিয়ে এলে সবাই উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। আমি তাদের জানাই তালেবের অপারেশন ভালোভাবেই চলছে।

সন্ধ্যা ৬.০০ : ওয়ার্ডে বিজলি বাতি জ্বলে উঠছে, তবে সব বাতি জ্বলে না। কোণার দিকের বেডে রহমত আলী তার পায়ের এক্স-রে প্লেটটি আলোর উল্টোদিকে ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। সে একজন বাসের হেলপার। অ্যাক্সিডেন্টে তার পা দুটো হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে গেছে। ডাক্তাররা জানিয়েছে, তার দুটো পা ভেঙে গেছে এবং দু'পায়ে অপারেশন করতে হবে। কিন্তু রহমতের দৃঢ় বিশ্বাস, তার শুধু ভেঙেছে বাম পা। অথচ ডাক্তাররা তার ভালো ডান পা-টাও অপারেশন করবেন। হাসপাতাল থেকে তার দু'পায়ের এক্স-রে করা হয়েছে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে দু'পায়েই ফ্র্যাকচার হয়েছে। কিন্তু রহমত মনে করছেন ভুল করে অন্য কারো এক্স-রে তার ফাইলে দিয়ে দেয়া হয়েছে। রহমত এক্স-রে প্লেটগুলো দেখার চেষ্টা করছিল। ডিউটি ডাক্তার তাকে তাকে ধমকে ওঠে, 'এই মিয়া এক্স-রে নিয়ে এতো কী ঘাঁটাঘাঁটি করো? ডাক্তার হওয়ার শখ হইছে? ওগুলো জায়গামতো রেখে দাও।'

রহমত আর বিশেষ কিছু বলার সাহস পায় না। সে আমাকে জানায়, 'আমি শিউর আমার

ডানপায়ে কিছু হয় নাই।' একটা এক্স-রে শিট দেখিয়ে ফিস ফিস করে বলে, 'দেখেন, একটা এক্সরেতে তারিখ দেয়া আছে আরেকটিতে নাই। দুটি এক্স-রে দুই জায়গার এটাই তার প্রমাণ।' আসলে পঙ্গু হাসপাতাল তো নিজেই পঙ্গু।

সব রোগী যদিও তার রেকর্ডপত্র নিয়ে রহমতের মতো এতোটা উৎসাহী না হলেও রোগের অবস্থাটি জানতে চায় স্বাভাবিকভাবেই। তবে ডাক্তারসহ হাসপাতালের কোনো কর্মী রোগীর এসব কৌতূহল মেটানোর প্রয়োজন বোধ করেন না। ইন্টার্নি ডাক্তার বা সিএ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টভাবে বলেন, 'আপনার পা ভালো হয়ে যাবে'। কিংবা 'এসব কি এতো তাড়াতাড়ি ভালো হয়'? 'সময় লাগবে' অথবা বলেন, 'আপনার এতো জানার দরকার কী? যা দরকার সেটাই আমরা করছি' ইত্যাদি।

রাত ১১.৪০ : ছোট শিশু পূর্ণিমা। বাড়ি নাঙ্গলকোট। আজ সকালে ধানভানা মেশিনের বেল্টের সঙ্গে ডান হাতটা পেঁচিয়ে গিয়ে থেতলে যায়।

আফজাল মিয়ার এই দোকান ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে

পূর্ণিমাকে নিয়ে তার বাবা-মা সেই সকালেই কুমিল্লা সদর হাসপাতালে গিয়েছিল। সেখান থেকে রাত ৯টার দিকে ঢাকায় এসেছে। পঙ্গু হাসতালের ফার্স্ট এইডেই বসে আছে। পূর্ণিমার শরীর থেকে প্রচুর রক্ত গেছে। ডাক্তার অবশ্য একবার এসে দেখে, এক ব্যাগ রক্ত আনতে বলে চলে গেছেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত রক্তের ব্যাগ হাতে পূর্ণিমার মা-বাবা অপেক্ষা করছেন।

রাত ৪.৪৫ : দারোয়ান হঠাৎ করে কলাপসিবল গেটটি খুলে দেয়। ওয়ার্ডবয় জাফর পুরনো ভাঙা ট্রলিতে একজন রোগীকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। ট্রলিতে শোয়া লোকটির একটি হাত গামছা দিয়ে বাঁধা। গামছা বাঁধা হাত থেকে অবিরাম রক্ত চুইয়ে পড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত

ডাক্তার আছে নার্স আছে কিন্তু চিকিৎসা কোথায়

পড়ে ফ্লোর ভিজে যাচ্ছে। লোকটি হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে বলছে, 'দেখেন আমার হাত শ্যাষ হইয়া গেলো। ওরে মারে, কেউ বাঁচাইতে আইলো না'। ডিউটি ডাক্তার কম্পাউন্ডার ও নার্সকে রোগীটিকে দেখতে বলেন। কাটা হাত লোকটিকে ওয়ার্ডের সঙ্গে লাগানো মিনি অপারেশন থিয়েটার (ওটি) রুমে নিয়ে মরচেপড়া টেবিলে তাকে শোয়ানো হয়। রোগী বেশ শক্তসমর্থ, সুঠাম এক যুবক। নাম বাদশা। পিতা মৃত ধলু জোয়ার্দার। বাড়ি নারায়ণগঞ্জের নিতাগঞ্জ। বয়স ২৫। একজন ডাক্তার হাতের ড্রেসিং শুরু করেন। হাতের পাঞ্জা প্রায় দ্বিখণ্ডিত অবস্থা। আঙ্গুলের রগ ও হাড় কেমন বীভৎসভাবে বেরিয়ে আছে। ডাক্তারের সহকারী ফাইলে রোগীর ইতিহাস লেখার জন্য তার নাম ঠিকানা জেনে নিলো। ডাক্তার সহকারী জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছিল'? বাদশা কাতর কণ্ঠে বলেন, 'আমি মফিজ ফ্লাওয়ার মিলে কাজ করি। হেইখানে আজ কাজ করতে গিয়া হুইলের মধ্যে হাত ঢুইকা যায়'। ড্রেসিংরত ডাক্তারটি বলেন, 'পেশেন্টকে মনে হয় মেইন ওটিতে নিতে হবে। ওর কাছ থেকে একটা কনসেন্ট সাইন করে নাও'। অন্য ডাক্তারটি বলেন, 'সে সাইন করবে কেমনে, ওর তো হাতই ঠিক নাই।...'

সকাল ৮.৪৫ : হাসপাতালের সামনে একটি সিএনজি থামে। উদ্বিগ্ন মুখে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ ১০/১২ বছরের একটি শিশুকে ধরাধরি করে নামিয়ে ইমার্জেন্সির দিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। পেছন পেছন আর একজন মহিলা উন্মাদিনীর মতো ছুটছেন। ১০ বছরের রায়হান স্কুলে যাবে বলে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেবলই বাড়ির সামনে থেকে একটি রিকশা নিয়েছিল। মুহূর্তে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয় রিকশাটিতে। রায়হান রিকশা থেকে পড়ে যায় এবং ট্রাকের একটি চাকা চলে যায় রায়হানের পেটের ওপর দিয়ে। রায়হানের মা এবং তার প্রতিবেশী মিলে হাসপাতালে নিয়ে আসে অজ্ঞান রায়হানকে। বুকের নিচ থেকে পুরো শরীর থেতলে গেছে রায়হানের। সে অচেতন কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে যে তখনো রায়হানের পালস আছে। রায়হানের অক্সিজেন প্রয়োজন, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ প্রয়োজন। ওয়ার্ডে একটি মাত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার যা ব্যবহার করা হচ্ছে আরেকজন মুমূর্ষু রোগীর ক্ষেত্রে। ডাক্তার ওয়ার্ডবয়কে বললেন পাশের ওয়ার্ড থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার আনতে। নার্স দ্রুত একটি জীবন রক্ষাকারী ওষুধের নাম লিখে রায়হানের বাবাকে তা আনতে বলেন। ছুটে যান রায়হানের বাবা। রায়হানকে স্যালাইন লাগিয়ে দেন নার্স। করিডরে দাঁড়িয়ে রায়হানের মা চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকেন। রায়হান ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ডাক্তার বিশেষ কায়দায় হাত দিয়ে বুকের ওপর পাম্প করে রায়হানের হৃৎপিন্ড চালু রাখার চেষ্টা করেন। রায়হানের জীবনের মূল্যবান কয়েকটি মুহূর্ত। সিলিন্ডার নিয়ে দৌড়ে আসে ওয়ার্ডবয়রা, ওষুধ নিয়ে ছুটে আসেন রায়হানের বাবা। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। রায়হান মৃত। ডাক্তার রায়হানের চোখের পিউপিল পরীক্ষা করেন এবং তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রায়হানের বাবা, তার হাতে কাগজে মোড়ানো জীবন রক্ষাকারী ওষুধ। খবর পেয়ে রায়হানের মা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। প্রতিবেশীরা তাকে টেনে নিয়ে শোয়ান করিডরের এক কোণায়। ডাক্তার চলে যান তার রুমে। ওয়ার্ডবয় মৃতদেহটি ট্রলির ওপর শোয়ায় এবং সারা শরীর সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর ট্রলিটিকে করিডরের এক কোণায় রাখে এবং রায়হানের বাবাকে বলে, রায়হানের ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষা করতে। রায়হানের বাবা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ট্রলির পাশে, তার চোখে পানি।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**